Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক : প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকা এক কবি

সায়ন্তন মণ্ডল

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/31_Sayantan-Mondal.pdf

সারসংক্ষেপ: পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরেও তাঁর প্রাপ্য মনোযোগ পাননি। বর্তমান পূর্ব বর্ধমানের এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম কোগ্রামে কবির জন্ম। সমসাময়িক কালের কবিদের প্রভাব এড়িয়ে কুমুদরঞ্জন নিজের এক উচ্চমানের জগৎ তৈরি করেছিলেন গ্রাম ও গ্রাম্য জীবনকে কেন্দ্র করে। প্রচারের আলো থেকে বহুদূরে থেকে তিনি একমনে সাহিত্যচর্চা করেছিলেন। কলমের নব নব ঝংকারে সৃষ্টি করেছিলেন অপরূপ সব কবিতা। গ্রাম বাংলার মাটির সোঁদা গন্ধ মাখা সেসব কবিতা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গ্রামের বাইরে থাকা রঙিন শহরে জীবনে গা ভাসানোর সুযোগ তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি সেসবের পরোয়া না করে আমৃত্যু গ্রামেই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালি একদিন তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করে উঠবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

সূচক শব্দ: পল্লীকবি, পল্লীপ্রীতি, 'মঙ্গালকাব্য', সোমনাথ মন্দির, আধ্যাত্মিক শক্তি, উজানি নগর, বাংলার মাটি, গ্রাম্য জীবন, কবিসত্তা, ভক্তকবি, মাতৃভক্তি

এই পৃথিবীতে অনেকসময় এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা নীরবে নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের কাজ করে যেতে ভালোবাসেন। কর্ম তাঁদের কাছে সাধনার মতো। প্রচারের আলো থেকে বহুদূরে সাধারণ মানুষের ভিড়ে তাঁরা একমনে নিজেদের কর্ম করে চলেন। তারপর একদিন চুপিসারে চলে যান এই পৃথিবীর সমস্ত জাগতিক মোহমায়া ত্যাগ করে দূরে, বহুদূরে। পিছনে পড়ে থাকে তাঁদের অনেক দিনের সাধনার ধন — সৃষ্টিকর্ম। লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে যায় তাঁদের অনালোকিত বর্ণময় জীবন। বাংলাসাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এমন অনেক কর্মযোগীর আবির্ভাব হয়েছে। যাঁরা কর্মফলের আশা না করে চুপচাপ নিজেদের কর্ম করে গেছেন। বেঁচে থাকতে তাঁরা একমনে নিজেদের কাজ করে চলেন, মৃত্যুর পর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যান নিজেদের সাহিত্যের অফুরান ভাণ্ডার। বাংলাসাহিত্যের এমনি একজন কর্মযোগী কবি হলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পশ্চিম বাংলার পূর্ব বর্ধমান জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর জন্ম ও আশি বছর জীবনযাপন। আজন্মকাল তিনি গ্রামেই জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। প্রচারের আলো থেকে দূরে তিনি এক দীর্ঘসময় মনের আনন্দে কলমের নব নব খোঁচায় সৃষ্টি করেছেন অনবদ্য সব সাহিত্যকর্ম। জীবন ও জন্মভূমিপ্রেমী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক গ্রামের মাটির কোলে বসে যেসব কবিতা লিখেছেন, সেইসব কবিতায় মাটির সোঁদা গন্ধ আজও অমলিন। বিভিন্ন সময় নানা লোভনীয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কুমুদরঞ্জন মাতৃস্বরূপা গ্রামের মায়া ত্যাগ করে কোনোদিন কোথাও যাননি বা যেতে পারেননি, থেকে গেছেন মায়ের কোমল স্নেহ-ছায়ায়। তিনি নিজের ব্যক্তিগত খ্যাতির চিন্তা না করে কর্ম করেছেন। হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'য় একস্থানে বলা হয়েছে —

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।।"[১]

অর্থাৎ যাঁর মন বশীভূত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধচিত্ত ও সর্বপ্রাণীর আত্মারূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, এইরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও তাতে লিপ্ত হন না।

১৮৮৩ সালের ৩ মার্চ বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার কোগ্রামে মাতুলালয়ে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের

জন্ম। কবির পিতৃপুরুষের আদি নিবাস ছিল বর্তমান পূর্ব বর্ধমান জেলার বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড গ্রামে। মল্লিক পদবি নবাব প্রদত্ত ছিল, পারিবারিক পদবি ছিল সেনগুপ্ত বা সেনশর্মা। কুমুদরঞ্জনের পিতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র মল্লিক, মাতা সুরেশকুমারী দেবী। মাতামহ নিঃসন্তান থাকায় কবি মাতুলালয় কোগ্রামে অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত-পালিত হন। কবির মাতামহের নাম নবীন কিশোর মজুমদার, মাতামহী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী। সতেরো বছর বয়সে শ্রীখণ্ড নিবাসী যুগল কিশোর রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সিন্ধুবালা দেবীর সঙ্গে তিনি সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন। কবির প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় কোগ্রামের পাঠশালায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কোগ্রামের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধনার এই কোগ্রাম। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সঙ্গে এই গ্রামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এই কোগ্রামই ছিল 'মঙ্গলকাব্যে'র বিখ্যাত উজানি নগর। এই গ্রাম বাংলার আদর্শ নারী বেহুলার জন্মভূমি, শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান, কবি লোচনদাসের পূণ্যভূমি। এই লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' লিখেছিলেন। এখানেই তিনি দীর্ঘকাল সাধনা ভজনা করে কাটিয়েছেন। তাঁর স্মৃতিতে এই অঞ্চলে লোচন সেতু রয়েছে, তাঁর সমাধিও এখানেই রয়েছে। এই গ্রামের প্রাণকেন্দ্র দেবী 'মঙ্গলচণ্ডীর' মন্দির এবং এই গ্রামের হৃদয় লোচন দাসের পাটবাড়ি। শিশু কুমুদরঞ্জন বড়ো হয়েছিলেন গ্রামের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে গীতা পাঠ, বাউল গান, ভক্তমালের গল্প, যাত্রাপালা, মেঠো গান, চণ্ডীর গান, 'রামায়ণ', 'মহাভারত'এর উপাখ্যান শুনে শুনে। এই গ্রামের জল-হাওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এক আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব রয়েছে, কুমুদরঞ্জনও এই শক্তির দ্বারা বিকশিত হয়েছিলেন। অজয় ও কুনুর নদী যেখানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেখানেই কোগ্রাম ঘাট অবস্থিত। এই ঘাট থেকেই একসময় ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর-সহ আরো অনেকের বাণিজ্যতরী তাদের যাত্রা শুরু করত। কবির পারিবারিক জীবন সুখের ছিল। সংসারে নানা অভাব থাকলেও, তা কখনো ভালো থাকার পথের অন্তরায় হতে পারেনি। একদিকে তাঁর পিতার উচ্চ জীবনাদর্শ, অপরদিকে গ্রামের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল; উভয়ই কবিকে বাল্যকাল থেকে পুষ্ট করেছিল, জীবনযুদ্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। গ্রামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আজন্মকাল বজায় ছিল। এই গ্রামে তিনি নিজের আত্মার শান্তি খুঁজে পেতেন। পরবর্তীতে গ্রাম ছেড়ে অন্যস্থানে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি কখনো সেই বিষয়গুলিকে বিশেষ পাত্তা দেননি। 'আত্মস্মৃতি' প্রবন্ধে তিনি নিজের গ্রাম সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, "আমি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করি, তাহা ছোট হইলেও নগণ্য নহে। পুরাণ ও কাব্যকাহিনী উহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে, কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এই গ্রামেরই ইতিহাস। শ্রীমন্ত সদাগরের বাড়ি এই গ্রামেই, সতী বেহুলা এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে মিথিলার গৌরব দান করিয়াছে। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের ইহা জন্মভূমি — বৈষ্ণব, শাক্ত উভয়েরই তীর্থস্থান।"[২] এই প্রবন্ধেই তিনি তাঁর পিতৃদেব সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র অত্যন্ত স্বাধীন, তেজস্বী, উদার, বন্ধুবৎসল, বিদ্যোৎসাহী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; জীবনে চলার পথে কোনোপ্রকার দুর্বলতা তিনি পছন্দ করতেন না। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, পুস্তু, উর্দু ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন, বেশিরভাগই ভক্তিমূলক। কবির মা সুরেশকুমারী দেবী ছিলেন কোগ্রামের নবীন কিশোর মজুমদারের প্রথমা কন্যা। কুমুদরঞ্জনের মাতৃভক্তি ছিল চোখে পড়ার মতো, মাকে নিয়ে তিনি নানাসময় নানা কিছু রচনা করেছেন। মাকে তিনি যেমন ভক্তি করতেন, তেমনি সময়ে সময়ে ভয়ও পেতেন। নিজের মায়ের মধ্যে কুমুদ জগজ্জননীর ছায়া দেখতেন।

পারিবারিক পরিবেশ, শান্ত-স্নিগ্ধ পল্লিপ্রকৃতি কবিকে সরল ও সাধাসিধে মনের মানুষ করে তুলেছিল। কুমুদরঞ্জন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কালিদাস রায় তাঁর 'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার' গ্রন্থের পরিচায়িকা অংশের শুরুতেই বলেছেন, "কবি কুমুদরঞ্জনের জীবনে অসামান্য বৈচিত্র কিছুই নাই, কবির কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ, জীবনের অভিজ্ঞতার পরিমাণ খুব ব্যাপক নয়, গৃহাসক্ত কবি পশ্চিমবাংলার অজয় তীরস্থ একটি গ্রামে ৮০ বৎসরের অধিককাল কাটাইয়া দিলেন।"[৩]

কবির প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয়েছিল গ্রামেরই পাঠশালায়। পড়াশোনায় তিনি বরাবর আগ্রহী ছিলেন,

পাঠশালার পড়াশোনা শেষ করে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য কলকাতায় আসেন। রিপন কলেজ থেকে এফ.এ পাস করেন এবং সিটি কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। ১৯০৬ সালের ২২ অক্টোবর কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের একান্ত অনুরোধে তিনি বাড়ির কাছে অবস্থিত মাথরুন নবীনচন্দ্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। আজীবন তিনি এই স্কুলেই শিক্ষকতা করেছেন, পরবর্তীতে তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। এই স্কুলেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন। কুমুদরঞ্জনের নজরুলের প্রতি স্নেহের কথা তাঁর স্মৃতিকথায় পাই, নজরুলও কবির প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কোগ্রামের পাশাপাশি মাথরুনও কবির জীবনের বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। এই মাথরুনেই কবি তাঁর অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছিলেন। কবির নিজের ভাষায়, "মাথরুনেই আমার অধিকাংশ কবিতা লেখা হয়। দিগন্ত শোভী ধান্যক্ষেত্র ও প্রকাণ্ড ময়দান আমার ভালোলাগিত। কোগ্রামের সমক্ষেত্র না হইলেও নানা অসুবিধা সত্ত্বেও মাথরুন আমার প্রিয়। এখানে আমি বহু সুখ, বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছি — আমার সহোদর ঐ সময়েই মারা যায়। কার্য্যকালেই আমি অনেক স্বজন হারাই — শেষ দিকে মাতা পিতা বিয়োগের দুঃখ সহ্য করি। আবার এখানে সুখও ঢের পাইয়াছি। আমার ছেলেরা এইখান হইতেই পাস করে। আমি সামান্য লোক হইলেও অপ্রত্যাশিত মান ও সম্মান লাভ করি। সেই জন্য মাথরুনের স্মৃতি আমার চিরদিনই জাগরুক থাকিবে।"[৪] এই গ্রামের অম্লমধুর স্মৃতি মাথায় রেখে তিনি লিখেছিলেন 'একটি গ্রাম' নামে কবিতা, কবিতাটি আসলেই ছিল তাঁর জীবনসঙ্গীত। মাথরুনের স্কুলে তিনি যোগদান করেছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধে। মহারাজার কাছে কবির বিশেষ খাতির ছিল। তবে এইজন্য তাঁকে নানা জনের ঈর্ষার সম্মুখীন হতেও হয়েছিল। নিয়মিত ডায়েরি লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল, সেসব পাতা থেকে মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার অনেক তথ্য আমরা পাই। তাঁর ডায়েরির একটি পাতায় তিনি লিখছেন, "Jogesh is trying his best to put me in prison. He has money, he has power, he will achieve success. God is alone great and I won't bow my head to anyone except him. May he give me peace."[৫] তবে বিপরীত পরিস্থিতিতে তিনি ভেঙে পড়েননি এবং পরবর্তীতে সেসব কথা মনেও রাখেননি। ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ আস্থা, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারো কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। আমরা আগেই আলোচনা করেছি তিনি নিষ্কাম কর্ম সাধনায় ব্রতী ছিলেন। কুমুদরঞ্জনের নিজের ভাষায়, "আমি একমাত্র ভগবানকে নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিয়া নিঃস্বার্থভাবে নির্ভয়ে কর্তব্য পালন করিয়াছি এবং মহারাজা তাহা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতেন ইহাই আমার সুখ ও সান্ত্বনা।"[৬] তাঁর এই কথার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তাঁর নির্ভীক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে তাঁর স্বার্থহীন কর্মযোগী চরিত্রের পরিচয়ও ফুটে ওঠে।

শিক্ষকতা কুমুদরঞ্জনের পেশা হলেও, তাঁর নেশা ছিল কবিতা লেখা। কবিতা লিখে পরবর্তী সময়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেও, কখনো সেই খ্যাতির আড়ালে নিজের প্রকৃত সত্ত্বাকে হারিয়ে যেতে দেননি। তিনি সকলের মাঝে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ভালোবাসতেন, কবিতা চর্চার জন্য কখনো তাঁকে ভিড় থেকে দূরে যেতে হয়নি। তাঁর মনঃসংযোগ এতোটাই ভালো ছিল যে, "মাথরুনে হোষ্টেলে যে ঘরে তিনি থাকতেন, সে ঘরেই চারটি ছাত্র উচ্চস্বরে পাঠ মুখস্ত করতো, কিন্তু এতে তাঁর কবিতা লেখার কোন বিঘ্ন তিনি অনুভব করেন নি।"[৭] কুমুদের এই মানসিক স্থিরতা দেখে তাঁর এক ইংরেজ শুভাকাঙ্ক্ষী J.G. Drummond কবি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'A privacy of glorious light is thine.' এ কথার প্রতিটি বর্ণই কবির জীবনে সত্য। তাঁকে কখনো একলা থেকে একলা হতে হয়নি। তাঁর সাধনা তাঁর মানসিক স্থৈর্য তাঁকে চরম কোলাহলেও নিঃশব্দের শান্তি দিতে পারত, জটিল ভিড়েও তিনি একাকিত্ব খুঁজে পেতেন। তাই অন্যান্য অনেক কবির মতো কুমুদরঞ্জন সহসা ফুরিয়ে যাননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাব্য ধারার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ ছিলো। কেননা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর মন ছিলো অন্তর্মুখি। সেই অন্তর্মুখি বিশ্বাস ও প্রজ্ঞা থেকেই তিনি লিখতে পেরেছিলেন।"[৮] আলাদা করে সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে তিনি সাধনা করেননি, তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল প্রকৃত সাধকের জীবন; তিনি জীবনসাধনায় বিশ্বাসী থেকে আমৃত্যু সেই সাধনাই করে গেছেন।

কুমুদরঞ্জনের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে কালিদাস রায় মন্তব্য করেছেন, "কুমুদরঞ্জনের কবিতা রচনা দেবার্চনার মতো। নানা বনফুল দিয়া তিনি পূজা করেন ইষ্টদেবতাকে — তারপরে সেই পুষ্পগুলির প্রতি আর তাঁহার মমতা থাকে না — সেগুলিকে ভাসাইয়া দেন কালের অজয়স্রোতে। কোথায় কে সেই প্রসাদী কুসুম তুলিয়া শিরে ধারণ করিল, তিনি তাহার সন্ধানও রাখেন নাই।"[৯] কালিদাস রায়ের এই বক্তব্যে কুমুদরঞ্জনের সাদামাটা, সহজ-সরল চরিত্র এবং জীবনযাপন সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। কবিতা রচনা আসলেই তাঁর জীবনযাপনের অন্যতম মাধ্যম ছিল। খ্যাতির জন্য কিংবা অন্য কোনো পার্থিব প্রাপ্তির বাসনা তাঁকে কবিতা রচনায় প্রেরণা দেয়নি। তিনি মনের আনন্দে লিখে গেছেন, কলমের স্পর্শে সৃষ্টি করেছেন নব নব সাহিত্যকর্ম। কুমুদের নিজের ভাষায়, "কবিতা লেখা আমার সখ বা জীবিকা নহে, উহা আমার জীবন। উহাদের মধ্যেই আমার জীবনধারা প্রসারিত। কবিতা আমি লিখিব বলিয়া লিখি না। রূপ গন্ধহীন হইলেও উহারা দেব অঞ্জানের ফুল — আপনিই ফোটে, আমি গড়িনা — আর ও সব ফুলই পল্লীজননীর পূজার ফুল।"[১০] তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'শতদল', 'বনতুলসী', 'উজানি', 'একতারা', 'বীথি', 'চূণ ও কালি', 'দ্বারাবতী', 'বনমিল্লকা', 'রজনীগন্ধা', 'নূপুর', 'অজয়', 'তূণীর', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'শতদল' থেকে শুরু করে 'তূণীর' পর্যন্ত মোট ১২টি কাব্যগ্রন্থ কুমুদরঞ্জন রচনা করেছিলেন মাথরুনে থাকাকালীন। তিনি যেসব পত্রিকার পৃষ্ঠা নিজের সৃষ্টিকর্ম দিয়ে অলংকৃত করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে 'সাধনা', 'ভারতী', 'সওগাৎ', 'এডুকেশন গেজেট', 'হিতবাদী', 'যমুনা', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মোসলেম ভারত', 'সবুজ পত্র', 'রামধনু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিজের প্রতিভার গুণে কুমুদরঞ্জন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠক সমাজের মধ্যে নিজের এক স্বতন্ত্র আসন লাভ করেছিলেন। কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'নব্যভারত' পত্রিকায়, তিনি তখন নবম শ্রেণির ছাত্র। 'বৃত্রসংহার', 'আশাকানন', 'বীরবাহু', 'চিন্তাতরঙ্গিনী', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি কাব্যের কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিহীনতা কুমুদরঞ্জনকে বিচলিত করেছিল, 'কবির প্রতি' শিরোনামে তিনি লিখেছিলেন —

"কেন বল অন্ধ আজি বৃত্র-সংহারের কবি।
যাঁর যুগ্ম নেত্র মাঝে ভাসিছে স্বরগ-ছবি।
কিব তব একি ভুল। ভাবিলে না একবার
চিত্ত-বিকাশের সনে বিদূরিত অন্ধকার।
যদিও বাহ্যিক চক্ষে অন্ধকার আজি তাঁর
উজলিছে জ্ঞানচক্ষু হৃদি মাঝে আনিবার।"[১১]

বাংলা সাহিত্যে কুমুদরঞ্জন প্রায় ৭৫ বছর ধরে বিরাজমান ছিলেন। ব্যাঙ্গাত্মক ও নীতিকথামূলক কবিতার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে কুমুদরঞ্জনের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দুই কাব্য 'শতদল' ও 'বনতুলসী'র কবিতাগুলি মূলত ছিল ব্যঙ্গ, নীতিকথামূলক, সেইসঙ্গে আধ্যাত্মিকরসে পরিপুষ্ট। এই কাব্যগ্রন্থদুটির কয়েকটি কবিতার নাম দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেমন 'সৎসঙ্গ', 'কুসঙ্গ', 'লোকহিত', 'মহাপ্রাণ', 'ঘোর বিশ্বাসী', 'বাক্য ও কার্য্য', 'জীবে দয়া', 'প্রকৃত সাধক', 'সংযম', 'কবিরাজ', 'মহৎ চরিত', 'সাধু ও গৃহী', 'কর্তব্য' প্রভৃতি। আমরা আগেই আলোচনা করেছি কবির গ্রামের আবহাওয়া এক আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, কুমুদরঞ্জনের উপর স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রভাব ছিল যা তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে। পল্লীকবি কুমুদরঞ্জনের কবিতার রস উপভোগ করার আগে তাঁর কবিমানসটিকে বোঝা প্রয়োজন। "কুমুদরঞ্জনের কবিমানসটি প্রেমাতুর সাধকের মানসের মতো রসগদ্গদ। এইরূপ কবিমানস ছিল কবিবর দেবেন্দ্রনাথের, আর কতকটা ছিল 'সারদামঙ্গল'এর কবির। কুমুদরঞ্জন তাঁহাদেরই ধারার কবি। এই মানস কবিতা রচনাকালে সম্পূর্ণ রসাবিষ্ট, অন্য সময়ে এই মানস অজ্ঞাতসারে রচনার উপাদান-সংগ্রহে রত। দিনের বেলায় ঘুম ভাঙার পরে শিশুর চোখে যেমন বহুক্ষণ ঘুমের আবেশ থাকিয়া যায়, তেমনি কাব্যসৃজনকালে রসতন্ময়তা অপগত হইলেও কবির চোখে রসের আবেশ থাকিয়া যায়। সেই রসাবিষ্ট দৃষ্টিতে তিনি সব সময়ই সৃষ্টিকে দেখেন। সকল

সময়ে সকল অবস্থাতেই মানসিক আবিষ্টতার নিরবচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। সেই জন্য কবি সব সময়ই কেমন যেন উদাসী।"[১২] কুমুদরঞ্জনের কবিতারচনা ছিল আসলেই সাধনা। নিজের ভদ্রাসনে বসে তিনি আজীবন নিষ্কাম সাধনা করে গেছেন বিশুদ্ধ চিত্তে, কোনো প্রকার দুর্বলতা বা চিত্ত চঞ্চলতাকে প্রাধান্য দেননি। এখানেই সাধারণ হয়েও কুমুদরঞ্জন অসাধারণ হয়ে উঠেছেন।

গ্রাম বাংলার নরম কোমল মাটিতে কবির জন্ম, মাঝে কিছুদিন পড়াশোনার জন্য বাইরে থাকলেও আজীবনকাল তিনি গ্রামেই কাটিয়েছিলেন। গ্রামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল হৃদয়াবেগের সহজ-স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, নদীর বহমান স্রোতের মতোই সেই ভালোবাসার প্রবাহ আমৃত্যু কুমুদের কবিচিত্তকে উজ্জ্বল রেখেছিল। গ্রাম, গ্রামের সাধারণ মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, গ্রামের রাস্তাঘাট, নদনদী, দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত সবকিছুই উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়, সেগুলির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয়। 'গ্রামের টান', 'নীড়ের মায়া', 'শহর ও গ্রাম', 'পল্লীবাসী', 'কৃষ্ণচূড়া', 'মেনী', 'গাব গাছ', 'গাঁয়ের কুকুর', 'ধান্য', 'জোনাকী', 'পাখীর দেশ', 'গ্রামের পথে', 'আমার বাড়ী', 'পতঙ্গ', 'আমগাছ', 'গ্রামের শোক', 'পল্লীশ্রী', 'একটি গ্রাম', 'অজয়ের চর', 'গ্রামের মেলা' প্রভৃতি কবিতায় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে গ্রাম, গ্রামের সঙ্গে জড়িত আরো অনেককিছু। গ্রামের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতোটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি মৃত্যুর পরেও এই গ্রামে পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। 'গ্রামের পথে' কবিতায় কবি বলেছেন, "ফিরে যদি জন্মাতে হয় / এই করুনা চাই, / এই গ্রামেতে দিও দয়াল, / ফিরে আমার ঠাঁই।"[১৩] কুমুদরঞ্জনের সিগনেচার কবিতা বলা যেতে পারে 'আমার বাড়ী' কবিতাটিকে। এই কবিতায় তাঁর বিখ্যাত লাইন, "বাড়ী আমার ভাঙ্গান-ধরা অজয় নদীর বাঁকে / জল যেখানে সোহাগ-ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।"[১৪] বস্তুত অজয়ের তীরে বাড়ি হওয়ার কারণে বন্যার সময়ে অজয়ের জল বার বার তাঁর বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তবুও কোনো এক অদৃশ্য মায়ার টানে তিনি কখনো তাঁর গ্রাম ছেড়ে কিংবা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাননি। জন্মভূমি তথা জন্মভিটের প্রতি তাঁর টান প্রবল ছিল যে মৃত্যুভয়ও সেই ভালোবাসায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। কালিদাস রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "জন্মভূমির প্রতি প্রেম তাঁহার এতই গভীর যে, সে প্রেমকে অন্ধ মমতা বলা যাইতে পারে। বার বার অজয় তাঁহার ভদ্রাসনকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তবু সেই অজয়তীর তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারিলেন না।"[১৫]

তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমীক কবি। অন্তর দিয়ে অনুভব প্রতিটি ঋতুর আসা-যাওয়া বিশেষ করে বর্ষা ঋতু নিয়ে তিনি অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। বন্যায় বার বার তাঁর বসতবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, তাছাড়া বর্ষাকালের স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ রয়েছে। কুমুদরঞ্জন সমাজ সচেতন কবি ছিলেন, তাঁর অনেক কবিতায় সেই সচেতনতার কথা ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতার মূল রসদ উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার জল, হাওয়া, মাটি, আকাশ, গাছপালা, পশুপাখি, নদনদী; সেই সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা থেকে। "কুমুদরঞ্জনের কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে জন্মভূমির প্রতি, বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও নরনারীর প্রতি গভীর প্রেম। এই প্রেম কখনও পুরাতন হয় না। ইহা নবনবায়মান।"[১৬] কবি সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্য এখানে স্মর্তব্য, "বাংলার মাটি জল, বাংলার হৃদয়ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যদি এদেশের কোনো কবির কাব্যের গভীর সংযোগ না থাকে, তবে তিনি বিশ্বকবি হ'তে পারেন, — বাঙালীর কবি ন'ন। কুমুদরঞ্জন বাংলার আসল কবি।"[১৭] কুমুদরঞ্জন প্রকৃতই বাংলার কবি ছিলেন, আমৃত্যু তিনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য কবিতা রচনা করেছিলেন। তবে নিজে বিশ্বকবি না হলেও, বিশ্বকিবর সান্নিধ্য তিনি খুব অল্প বয়সেই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কুমুদের প্রথম আলাপ হয় কলকাতায় যখন কুমুদ এফ.এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কুমুদের রচনাশৈলী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, নিজের অভিজ্ঞ চোখে কুমুদের ভবিষ্যৎ অনুমান করে বলেছিলেন, "আপনার কবিতা আমাদের বঙ্গ সাহিত্যে অম্লান শোভায় বিরাজ করিবে।"[১৮] বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছিল। কুমদরঞ্জন রবীন্দ্র অনুগামী হলেও তাঁর লেখায় কবির প্রভাব সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না। পল্লীকবির কবিতার স্রোত তাঁর কলমের স্পর্শে নব নব পথে প্রবাহিত হয়েছিল।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন ভক্তকবি। তাঁর ভক্ত হৃদয়ের সঙ্গো যুক্ত হয়েছিল গভীর দেশপ্রেম। 'ভারতচিত্র', 'ভারত মহিমা', 'আমাদের ভারত', 'ভারত দাস-পর্ব' প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূজাকেন্দ্রিক কবিতার মধ্যে 'আগমনী', 'পূজার পদ্ম', 'পূজায়', 'পূজার আদর', 'পূজার ফুল', 'শারদীয়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতির পাশাপাশি ভারতবর্ষের সাধুসন্তদের প্রতি কুমুদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা 'সাধু-সন্ত', 'ভক্ত বৎসল', 'ভক্তের ভগবান', 'সাধন পথে', 'ভৃগু মুনি' প্রভৃতি কবিতায় পাওয়া যায়। 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'কথামৃত' প্রভৃতি বইগুলি তাঁর পছন্দের তালিকার প্রথমদিকে ছিল। বীরভূম জেলার সিউড়ির অধিবাসী স্বামী সত্যানন্দকে কুমুদরঞ্জন গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন, মাঝে মাঝেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতেন। এই স্বামীজীই কবিকে 'কবিসুন্দর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দেশমাতৃকার পাশাপাশি জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। 'মা', 'মায়ের সোহাগে', 'মায়ের শেষ চিঠি', 'মাতৃস্তোত্র' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর মাতৃপ্রেম, আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল। 'মা-হারা' কবিতার প্রতি ছত্রে তাঁর শোকাহত হৃদয়ের ক্রন্দন অনুভব করা যায়। মায়ের চলে যাওয়া কবিকে বিচলিত করেছিল, দীর্ঘকাল মায়ের অভাব তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ের অনেক লেখায় সেই শূন্যতার বেদনা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

কুমুদরঞ্জনের নিজের ধর্ম ও ধর্মীয় আস্থার উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রকৃতই একজন উচ্চমানের হিন্দু ছিলেন। সনাতন ধর্মের উপর নানা সময় নেমে আসা আঘাত তাঁকে বিব্রত করেছিল, বিশেষ করে সোমনাথ মন্দিরের উপর আসা আঘাতের কথা ভেবে তিনি কষ্ট পেতেন। এমনকি তাঁর এই বিশ্বাসও ছিল যে, কোনো এক জন্মে তিনি এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন। তিনি সোমনাথ মন্দিরের উপর প্রায় ১০৮টি কবিতা লিখেছিলেন, এই থেকে তাঁর ভক্ত হৃদয়ের মর্মস্পর্শী ছবিটি সহজেই আমাদের সামনে উঠে আসে। 'গরলের নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সোমনাথ মন্দির কেন্দ্রিক কবিতাগুলি 'কালাতীত', 'সোমনাথ স্মরণে', 'সোমনাথের মালাকার', 'সোমনাথ', 'মেগাস্থিনিসের সোমনাথ দর্শন (৩০৫ খ্রিঃ পূঃ)', 'হুয়েঙশাঙ এর সোমনাথ দর্শন (৬০৩ খ্রিঃ অঃ)', 'আলবেরুনীর সোমনাথ দর্শন (১০২৪ খ্রিঃ অঃ)' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সোমনাথ মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে তিনি ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলেন, মনের আনন্দে কবিতা লিখেছিলেন সেদিন। 'শ্রীশ্রী সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিবেস (২৭ বৈশাখ ১৩৫৮)' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন —

"... শুভ নবযুগ, শুভ সুপ্রভাত —
যোগ-মগন জাগিলেন সোমনাথ।
গোটা ভারতের আজি মুক্তিস্নান
পতিত জাতির আজি পুনরুত্থান —
এসেছেন শিব শম্ভু মহেশ্বর
ব্যোম ব্যোম হর হর।"[১৯]

কবি নিজে ধর্মপ্রাণ হিন্দু হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর মনে কোনো বিদ্বেষ ছিল না, তিনি প্রকৃতই শান্তির পূজারী ছিলেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় অনেক কবিতায় উঠে এসেছে। 'খ্রীষ্ট' কবিতায় তিনি নিজে খ্রিস্টান না হয়েও ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ক্রুশের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। আবার 'মন্দির ও মসজিদ' কবিতায় তিনি মন্দির ও মসজিদকে দুই বন্ধু হিসেবে তুলে ধরেছেন, দূর করতে চেয়েছেন ধর্মের বেড়াজাল। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদের অন্যতম কারণ যে রাজনীতির নেতারা সেই কথা দেখতে পাই 'দুই বন্ধু' কবিতায়। কবিতায় বলেছেন —

"আমরা হিন্দু আমরা মুসলমান
যেমনি ছিলাম তেমনি থাকিতে চাই।
রাজনীতিবিদ করোনাকো হয়রাণ
কেহ গরিষ্ট কেহ লঘিষ্ঠ নাই।"[২০]

জীবনের শেষ পর্যায়ে রোগশয্যায় লিখেছেন 'রোগশয্যায়' কবিতা, "রাঙ্গা রবির উদয় দেখে আনন্দে মোর মন মাতে / ইচ্ছা করে নূতন দেশে নূতন হয়ে জন্মাতে।"[২১] বোঝা যাচ্ছে শেষবেলায় এসে তিনি নিজের মনকে তৈরি করেছেন পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। সময় আসন্ন বুঝে লিখেছেন 'বিদায়বেলা' —

"সকল বাঁধন ছিঁড়তে হবে, সময় নাহি বাকি রে —
যাবার আমার সময় হল — শঙ্খ জানায় ডাকি রে।
ডাক শুনেছি, শুনেছি ডাক, যেতে হবে জল্‌দি হে —
ও ভিজে পথ ভিজাব না তবু নয়ন জল দিয়ে।"[২২]

জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কত ইতিবাচক ছিল সেটা এই লেখা থেকেই বোঝা যায়। এক সময় আমাদের সবাইকে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরলোকের উদ্দেশ্যে যেতে হয়। কুমুদরঞ্জন সেই আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে নিজেকে দুর্বল করেননি, বরং মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কুমুদরঞ্জন কখনই কোনো কিছু পাওয়ার বাসনা নিয়ে কর্ম করেননি, সাহিত্য রচনাও কখনো নাম অর্জনের জন্য করেননি; করেছিলেন নিজের মনের আনন্দে। ১৯৭০ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার পান। আত্মপ্রচার তাঁর পছন্দ ছিল না, নিষ্কাম কর্মে তিনি আজীবন অচল ছিল। নাগরিক জীবনের গতিময়তা তাঁর অপছন্দ না হলেও সেই গতিময়তা থেকে বহুদূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের কবিসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন আমৃত্যু। ১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কবির জীবনাবসান ঘটে।

তথ্যসূত্র:

১. 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শ্লোকার্থসহ', গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, পৃ. ৭৩
২. 'মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৫৭ সংখ্যা, 'আত্মস্মৃতি' প্রবন্ধ, পৃ. ২৩৫
৩. 'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার', শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায়ের লেখা পরিচায়িকা অংশ দ্রষ্টব্য, মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৭ (অতঃপর 'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার' নামে উল্লিখিত)
৪. 'কুমুদ কাব্যমঞ্জুষা', শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৮, পৃ. ৭-৮ (অতঃপর 'কুমুদ কাব্যমঞ্জুষা' নামে উল্লিখিত)
৫. ওই, পৃ. ৯
৬. ওই, পৃ. ১১
৭. ওই, পৃ. ১১
৮. ওই, পৃ. ১১
৯. 'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার', পূর্বোক্ত শ্রীকালিদাস রায়ের লেখা পরিচায়িকা অংশ দ্রষ্টব্য
১০. 'কুমুদ কাব্যমঞ্জুষা', পৃ. ২৫
১১. 'নব্যভারত' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩০৬ সংখ্যা, পৃ. ৪৪৭
১২. 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা', শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায়ের লেখা পরিচায়িকা অংশ দ্রষ্টব্য, মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২ (অতঃপর 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে উল্লিখিত।)
১৩. 'রামধনু পত্রিকায় প্রকাশিত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা', সম্পাদনা সায়ন্তন মণ্ডল, বীরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, কালিমোহন পল্লী, ওয়ার্ড নং ৬, বোলপুর, ৭৩১২০৪, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০২৪, পৃ.৬৭
১৪. ওই, পৃ. ৬৫
১৫. 'কুমুদরঞ্জন কাব্যসম্ভার', পূর্বোক্ত শ্রীকালিদাস রায়ের লেখা পরিচায়িকা অংশ দ্রষ্টব্য
১৬. ওই
১৭. 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পূর্বোক্ত শ্রীকালিদাস রায়ের লেখা পরিচায়িকা অংশ দ্রষ্টব্য

১৮. ‘সাহিত্যতীর্থ’ ১৮শ বার্ষিকী, ১৩৭৮, পৃ. ৪৭
১৯. ‘কুমুদ কাব্যমঞ্জুষা’, পৃ. ২০৯
২০. ওই, পৃ. ৩৪৯
২১. ওই, পৃ. ১৯১
২২. ওই, পৃ. ২৭১

লেখক পরিচিতি: সায়ন্তন মণ্ডল, ভারত সরকারের অনুদান প্রাপ্ত পিএইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।